Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 140-147
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.091

হোজাই জেলার যোগীজান অঞ্চলের রাজবাড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী মন্দিরসমূহ

চিরঞ্জিৎ দাস, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়, হোজাই, অসম, ভারত*

Received: 11.02.2026; Accepted: 13.03.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The ancient royal palace located in the Yogijan area of Hojai district, Assam, is the Yogijan Rajbari. The palace is situated on the banks of the Kapili River. Associated with this palace are many elements of the ancient society and culture of this region. Here, broken idols made of black stone, several Shiva lingas, and statues of gods and goddesses have been discovered. A notable feature is the presence of a special stone known as 'Raktashila' (Bloodstone), which turns red upon contact with water. The Kalika Purana contains references to this region. There is a popular belief that this palace is connected to the Kamakhya Temple in Guwahati, although direct evidence for such assumptions is currently insufficient. Nevertheless, the site can be considered an important archaeological and tourist center. In this paper, we attempt to highlight this aspect.

Keywords: Yogijan Rajbari, Archaeological Tourism, Shiva lingas, Shiva Tample, Raktashila (Bloodstone)

আদিকাল থেকে লৌকিক পরম্পরার ভাণ্ডার ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্যে ভরপুর ভারতবর্ষ, যেখানে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি, সহস্রাধিক পৌরাণিক ও লোকায়ত ইতিহাস মানুষের কল্পনা ও বিশ্বাসের পর্দায় সংস্কারিত হয়ে গেছে। প্রাগজ্যোতিষপুর নামে খ্যাত প্রাচীন অসম ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের বহু ধ্বংসস্তূপ আজও সেই অতীতের জীবন্ত সাক্ষ্য বহন করে। ভগ্ন মন্দির, ছিন্নভিন্ন ভাস্কর্য আর ধসে যাওয়া গর্ভগৃহ যেন নীরবে জানিয়ে দেয় একদিন এ অঞ্চলও ছিল মহাকাব্যিক স্মৃতির অংশ।

সময়ে সময়ে দেশান্তর থেকে আগত শাসকদের হাতে মোগল আক্রমণ থেকে শুরু করে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নির্মম লুটপাট, অনেক মঠ–মন্দির ও তাদের ভাস্কর্য চিরতরে ধ্বংস হয়েছে। ভাঙা শিলালিপি, গুঁড়িয়ে দেওয়া মূর্তি, শূন্য গর্ভগৃহ সব মিলিয়ে আজও যেন সেই নীরব আর্তনাদের ধ্বনি শোনা যায়। নানা জনজাতির বহুবর্ণ সহাবস্থানে গড়া এই অসমের একটি জেলা হোজাই এবং তারই অন্তর্গত একটি অঞ্চল যোগীজান, যার নামের ভেতরেই যেন লুকিয়ে আছে যোগ, তপস্যা ও সাধনার দীর্ঘ স্মৃতি। যোগীজান এমন এক ভূখণ্ড, যেখানে অলিয়ে–গলিয়ে ছড়িয়ে আছে ভগ্ন মন্দির, শিলাস্তম্ভ, ভাঙা মূর্তি ও নানাবিধ ভাস্কর্যের অবশেষ, এবং এই সমস্ত কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক রহস্যময় প্রত্নস্থান— রাজবাড়ি। এই রাজবাড়ির পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান যেমন এক বিশাল ইতিহাসের দরজা খুলে দেয়, তেমনি অজস্র অনুত্তরিত প্রশ্নেরও জন্ম দেয়। এই প্রবন্ধ সেই ইঙ্গিতগুলোরই কিছু প্রতিচ্ছবি ধরে রাখার প্রয়াস।

কথিত আছে, এককালে এই অঞ্চলে বহু যোগী–তপস্বী আস্তানা গেড়েছিলেন। তাঁদের পূজা–অর্চনা, স্নানাদি ও নিত্যকর্মের জন্য কপিলি নদীর জল সরাসরি পাওয়া সম্ভব না হওয়ায় নদী থেকে একটি সরোবর বা জান (জলাধার) খনন করা হয়, যা পরে যমুনা নদীর সঙ্গে যুক্ত হয়। যোগীদের সৃষ্টি এই জানটির থেকেই জায়গাটি পরিচিত হয় "যোগীজান" নামে। কেবল এক জলাশয়ের স্মৃতি নয়, বরং এক তপস্যাকারী মানবসমাজের সংগৃহীত অভিজ্ঞতাও নিরবধি হয়ে থাকে। বর্তমানের যোগীজান সেই যোগী জানের স্মৃতি, কপিলির স্রোত আর প্রাচীন মন্দির ঘেরা ধ্বংসস্তূপকে বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অলিতে–গলিতে ছড়িয়ে থাকা শিলাস্তম্ভ, ভগ্ন প্রতিমা, পুরনো ইট–পাথরের গায়ে লেগে থাকা শ্যাওলা আর মাটির গন্ধ, সব মিলিয়ে যোগীজান যেন নিজেই এক উন্মুক্ত প্রত্নতাত্ত্বিক পাঠাগার। এই সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে রাজবাড়ি— যার নাম, গঠন ও স্মৃতির মধ্যে জড়ানো আছে আরেক স্তরের ইতিহাস।[১]

একটি অঞ্চলের নাম তার ইতিহাসের প্রথম দরজা। স্থানীয় লোককথা বলে, একসময় মণিপুরের রাজপরিবারের কিছু সদস্য কাছার অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন, পরে নদী–নালা, উর্বর মাটি ও জীবনযাপনের সুবিধা দেখে তারা ক্রমে কপিলি নদী–তীরবর্তী এই এলাকায় এসে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। এখানে তাদের জন্য গড়ে ওঠে বিশেষ আবাসস্থল— রাজপরিবারের নির্জন কিন্তু নিরাপদ বাসভূমি। এই প্রাসাদ–কেন্দ্রিক আবাসকে ঘিরেই জায়গাটির নাম হয় "রাজবাড়ি"— অর্থাৎ রাজার বাড়ি, রাজ–বাসভূমি।[২] সময়ের সাথে অনেক কিছু বদলালেও আজও রাজবাড়ি গ্রামের চারপাশে মণিপুরি জনগোষ্ঠীর বিশেষ উপস্থিতি সেই প্রাথমিক ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেয়, যদিও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্যান্য জাতি–জনগোষ্ঠীর লোকেরাও। অসমের হোজাই জেলার যোগীজান অঞ্চলে অবস্থিত এই প্রাচীন রাজবাড়ি এবং তার পার্শ্ববর্তী প্রত্ননিদর্শনসমূহ এক বহুমাত্রিক ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদের আধার। বহু যুগ ধরে স্থানীয় লোকবিশ্বাস, মন্দির–সংলগ্ন আচার, মৌখিক কাহিনি ও পুরাণের টুকরো–ইঙ্গিত মিলিয়ে এই ভূখণ্ডকে ঘিরে তৈরি হয়েছে এক জটিল অথচ টানটান স্মৃতিকথা। কৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ কমিটির তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নথি অনুসারে, রাজবাড়ি প্রত্নস্থলে পরিকল্পিত বিন্যাসে একাধিক শিবমন্দিরের ভগ্ন অবশেষ পাওয়া গেছে ইট ও পাথরে নির্মিত এই স্থাপত্যের বয়স নবম–দশম শতাব্দীর মধ্যে বলে ধরা হয়।[৩] শিবলিঙ্গ, দরজার অলংকৃত ফ্রেম, স্তম্ভের খণ্ডাংশ, পাথরের শিরস্তম্ভ, নানা প্রতিমা ও ভগ্ন মূর্তি— সব মিলিয়ে এখানে যে কেবল একটি মন্দির নয়, বরং সম্পূর্ণ একটি "মন্দির–কমপ্লেক্স" গড়ে উঠেছিল, তার ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা যোগীজানের রাজবাড়ি অঞ্চলে পাওয়া মূর্তি, ইট–পাথরের গঠন, অলংকরণ ও শৈলী বিশ্লেষণ করে এগুলোর বয়স আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে স্থির করেন। তাঁদের মতে, এসময়ে উত্তর–পূর্ব ভারতের বহু অংশে পাল ও পরবর্তী বর্মণ প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল, রাজা 'দেবপাল'এর একটি ছোট মূর্তি এবং ১৯৫৩ সালে পাওয়া 'পালসরকার' নামের মুদ্রা। 'দেবপাল' নামের সংস্কৃত লিপি ও তামার মুদ্রাটিতে লেখা 'পালসরকার' লিপিটিও সংস্কৃত তাই পালবংসের রাজত্বকালে এগুলোর নির্মাণ বলে মনে করা হয়।[৪] কপিলি–যমুনা নদী উপত্যকাও ওই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ধারার অন্তর্ভুক্ত। কপিলি নদীর তীরবর্তী নানা স্থানে— যেমন ন-নাথ, শংখ্যাদেবী, শিবপুর ইত্যাদি জায়গায় প্রাপ্ত শিলামন্দির, প্রতিমা ও স্থাপত্যশৈলীও একই সময়সীমার ইঙ্গিত দেয়। ফলে কৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ কমিটির প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ধারণা করেন, এই সমগ্র অঞ্চলটাই কোনো এক প্রাচীন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় এক বৃহৎ মন্দির–সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। তবু এসব মতামত এখনো প্রমাণ–সম্পূর্ণ নয় একদল লোক মনে করেন পাল রাজত্বকালে এই মন্দিরগুলো উদ্ধার করা হয়েছিল যেগুলো পরবর্তীতে ধ্বংস হয়ে যায় এর আসল ইতিহাস আরও অনেক প্রাচীন।[৫] লিখিত শিলালিপি, নির্দিষ্ট দানের দলিল বা নির্মাণকাল নির্দেশক শ্লোকের অভাবে গবেষণা মূলত শৈলী–মধ্যস্থিত তুলনা, অন্যান্য স্থানের সঙ্গে মিল, এবং

মৌখিক ইতিহাসের উপর নির্ভর করেই এগোচ্ছে। তাই প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর নির্ভরশীল অনুমানই আজও এখানে প্রধান ভিত্তি হয়ে আছে।প্রাচীন প্রাগজ্যোতিষপুর ছিল কামরূপা রাজ্যের এক গৌরবময় রাজধানী, যেখানে বিভিন্ন রাজবংশ— বর্মণ, ম্লেচ্ছ, পাল প্রভৃতি রাজশক্তি কালক্রমে শাসন করে গেছেন। এই প্রাচীন ঐতিহ্যের স্রোতই কপিলি–যমুনা উপত্যকার দিকে গড়িয়ে এসেছে বলেই মনে করেন আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকরা। কপিলি–যমুনা উপত্যকার মধ্য স্থানে— শংখ্যাদেবী, ন-নাথ, কেন্দুগুরি, শিবপুর, ওয়ারগেডেং, নাউভাঙ্গা ইত্যাদিতে— যে মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, পাল–সেন যুগীয় ভাস্কর্য, ধ্বংসস্তূপ ও শিলামূর্তি পাওয়া গেছে, তাতে বোঝা যায় এই উপত্যকাও কোনো এক সময় প্রাগজ্যোতিষপুর কেন্দ্রিক বৃহত্তর সাংস্কৃতিক পরিসরেরই অংশ ছিল। রাজবাড়ি সেই পরিসরেরই এক উজ্জ্বল অথচ আংশিকভাবে অনাবিষ্কৃত অধ্যায়।[৬]

আজ যে জায়গাটিকে রাজবাড়ি বলে চিনে নেওয়া হয়, একসময় তা ছিল কেবল একটি নিরীহ টিলার মতো উঁচু জমি, চারদিকের সমতল থেকে একটু আলাদা, কিন্তু নীরব। গ্রামবাসীরা শুধু লক্ষ্য করত— টিলার গা থেকে কয়েকটি পাথরের স্তম্ভ আংশিক বেরিয়ে আছে, যেন মাটির বুকের ভেতর থেকে কেউ হাত বাড়িয়ে আছে।

চিত্র নং ১: খনন কার্য অসম্পূর্ণ থাকা স্থান

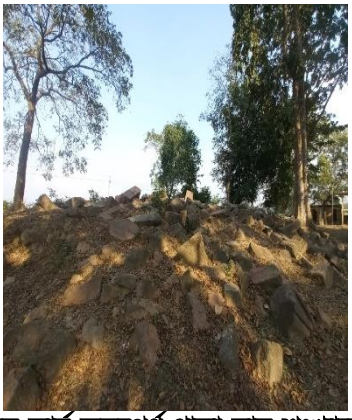

চিত্র নং ২: খনন কার্য অসম্পূর্ণ থাকা স্থান শংখ্যাদেবী মন্দির

১৯৫৬ সালের দিকে গৌরমণি সিংহ নামের এক ব্যক্তি কিছু মূল্যবান ধাতু বা সম্পদ পাওয়ার আশায় ওই টিলায় খনন শুরু করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিলনা মন্দিরের প্রতিমা, বা ভাস্কর্য পাওয়ার বরং ধনরত্নের আশায়, সাধারণ মানুষের এক স্বপ্ন থাকেই এমন। কিন্তু মাটি তাঁকে ফিরিয়ে দিল অন্যরকম সম্পদ, একটি ভগ্ন মূর্তির রূপে, যা নিছক পাথর নয়, বরং এক প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন। সেই প্রথম মূর্তি বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই টিলাটা যেন নিজেকে ভাষাহীনতা থেকে মুক্ত করে দিল; মানুষ বুঝতে শুরু করল, এখানে বহুকাল আগে কিছু একটার উপস্থিতি ছিল, যা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এখনো লিখিত হয়নি।এই খননের পরই ধীরে ধীরে শুরু হয় সুসংগঠিত অনুসন্ধানের কাজ। স্থানীয়ভাবে গড়ে ওঠে কৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ কমিটি, পরে প্রত্নতাত্ত্বিক দপ্তরের উদ্যোগে রাজবাড়িতে পরিকল্পিত খনন শুরু হয়, এবং প্রাচীন এক মন্দির–কমপ্লেক্সের আংশিক নকশা দিনদিন উন্মোচিত হতে থাকে। রাজবাড়ির প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের আড়ালে যে ব্যক্তির নাম বারবার উচ্চারিত হয়, তিনি ঐতিহ্য মিত্র কৃষ্ণকুমার সিংহ—একজন সুদক্ষ রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, লেখক এবং সর্বোপরি এই অঞ্চলের পৌরাণিক

চিত্র নং ৩: ঐতিহ্যমিত্র কৃষ্ণ কুমার সিংহের সাথে সাক্ষাৎকারের একটি চিত্র।

কৃতিচিহ্নের প্রতি অদম্য অনুরাগী এক মানুষ। তাঁর নেতৃত্বেই গঠিত হয় কৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ কমিটি, যার লক্ষ্য ছিল প্রথমত স্থানটি রক্ষা করা, দ্বিতীয়ত প্রত্ন-অবশেষগুলোকে নির্বিচারে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো, এবং তৃতীয়ত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এগুলোকে নথিভুক্ত রাখা।[৭] বয়সের শেষ প্রান্তে পৌঁছে, শয্যাশায়ী অবস্থাতেও যখন তিনি রাজবাড়ির ইতিহাস বলতে গিয়ে কণ্ঠ থামাননি, তখন বোঝা যায় এই ভূমির সঙ্গে তাঁর বন্ধন কেবল গবেষণা-কৌতূহলের নয়, বরং এক অগাধ মানসিক প্রেমের। রাজবাড়ির প্রতিটি স্তম্ভ, প্রতিটি ভগ্নমূর্তি, প্রতিটি শিলালিপি তাঁর কাছে যেন জীবন্ত চরিত্র, যাদের আপনি-আপনি সম্বোধনে তিনি ডেকে উঠেছেন সারাজীবন। অসম সরকার তাঁকে "বিশ্ব ঐতিহ্য মিত্র" সম্মাননা ও আর্থিক পুরস্কার দিলেও, তাঁর প্রকৃত গৌরব লাভ হয় তখনই, যখন দূর-দেশের কোনো গবেষক রাজবাড়িতে এসে প্রথমেই কৃষ্ণকুমার সিংহের কথাই জানতে চায়।[৮]

সরকারি সুরক্ষা আসার আগে রাজবাড়ি প্রত্নস্থল ছিল অরক্ষিত এক খোলা এলাকা, যেখানে যেকোনো সময় চুরি, ভাঙচুর বা ব্যক্তিগত লোভের কারণে অমূল্য প্রত্ননিদর্শন হারিয়ে যেতে পারত। কৃষ্ণকুমার সিংহের নেতৃত্বে স্থানীয় লোক একত্র হয়ে গঠন করে কৃতিচিহ্ন সংরক্ষণ কমিটি। গ্রামের সাধারণ মানুষ, শিক্ষক, ব্যবসায়ী, কৃষক— সবাই মিলে নিজেদের ঐতিহ্যকে রক্ষা করার লড়াইয়ে নামেন। তাঁদের রাতের পাহারা, সচেতনতা-সভা, বাইরের লোককে সচেতন করা— সবশেষে এই জনপ্রচেষ্টাই সরকার "অসমের প্রাচীন কৃতিচিহ্ন এবং তথ্য অধিনিয়ম ১৯৫৯" প্রত্নতাত্ত্বিক সঞ্চালকালয়ের অধীনে আনা হয়। আজ রাজবাড়ি প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের অধীনে সুরক্ষিত; কিন্তু তার পেছনে যে লোকউদ্যোগের দীর্ঘদিনের ঘাম ঝরে আছে, তা কখনো ভুলে গেলে চলবে না।[৯]

রাজবাড়ির মূল প্রত্নস্থলটি যেন এক ছোট্ট মহাকাশের মতো, যেখানে ছয়টি পৃথক মন্দির মিলেমিশে গড়ে তুলেছে এক সমগ্র ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আঙিনা। এই ছয়টি মন্দিরই রাজবাড়ির পরিচয়ের কেন্দ্রে— হরগৌরী মন্দির, ভৈরব মন্দির, মূল শিব মন্দির, দ্বিতীয় শিব মন্দির, বৈঠকখানা এবং সামগ্রিক প্রাঙ্গণকে ঘিরে থাকা অন্যান্য শিবের সাথে সম্পর্কিত স্থাপত্য। হরগৌরী মন্দিরের নামকরণ একেবারেই প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের সাথে সরাসরি যুক্ত, এখানে যে মূর্তিটি পাওয়া যায়, তাতে হর (শিব) ও গৌরীর যুগলমূর্তি এক গর্ভগৃহে মিলিত হয়ে আছে। এই যুগল-রূপ শৈব ও শাক্ত, পুরুষ ও প্রকৃতির একাত্মতার প্রতীক হিসেবে ধরা যায়, যা একদিকে পারিবারিক-গার্হস্থ্য ভাবনা, অন্যদিকে তান্ত্রিক শক্তি-দর্শনের ইঙ্গিত বহন করে। হরগৌরী মন্দিরটি কালো পাথর বা ব্ল্যাক স্টোন দিয়ে নির্মিত বলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মত, যা নির্মাণ কালীন উন্নত শিল্প রুচি ও অর্থবলকে স্পষ্ট করে। ভৈরব মন্দিরের ক্ষেত্রে নামটি এসেছে কাঠামো ও উদ্ধার হওয়া শিবলিঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেখে।[১০]

চিত্র নং ৪: হরগৌরী মন্দিরের মূর্তি

চিত্র নং ৫:
ভৌরব মন্দিরের শিবলিঙ্গ

চিত্র নং ৬: শিব মন্দির

মন্দিরসমূহের মাঝখানে অবস্থিত মূল শিব মন্দিরটি এই প্রত্নস্থলের হৃদয়স্থল বলেও ধরা যায়। এখানে এখনও পূজিত শিবলিঙ্গ রয়েছে; খননের সময় পাওয়া পোড়া মাটি, যজ্ঞের চিহ্ন এবং পুরাতন মুদ্রা প্রমাণ করে যে একসময় এটি ছিল নিয়মিত পূজা, যজ্ঞ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের কেন্দ্র। অতীতের সেই অগ্নিযজ্ঞের কালী আর বর্তমানের ধূপ-ধূনার গন্ধ এখানে আজও অবস্থিত দ্বিতীয় শিব মন্দিরটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে খননের সময় যে সমস্ত সামগ্রী পাওয়া গেছে, তার অধিকাংশই নারীদের ব্যবহৃত যেগুলোর সঙ্গে পুরুষসত্তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক পাওয়া যায় না। এই তথ্য থেকেই স্থানীয়দের ধারণা, এটি ছিল মূলত নারীদের পূজা-আর্চনার স্বতন্ত্র স্থান একধরণের 'নারী-কেন্দ্রিক মন্দির', যেখানে পুরুষ সম্ভবত সীমিত বা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। এই দ্বিতীয় শিব মন্দিরের খনন আজও সম্পূর্ণ হয়নি। রাজবাড়ির এই প্রাঙ্গণ থেকে বহু ভাস্কর্য, প্রতিমা ও প্রত্নবস্তু বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে; বিশেষ করে গুয়াহাটি প্রত্নতাত্ত্বিক সংগ্রালয়ে এখানে উৎখনিত কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন সংরক্ষিত রয়েছে। সে কারণেই রাজবাড়ি কেবল স্থানীয় ইতিহাসের নয় বিস্তৃত ঐতিহ্যেরও একটি গবেষণা-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সবশেষে আসে বৈঠকখানা, নামে যেমন বোঝা যায়, এটি ছিল সমবেত হওয়ার, আলোচনার ও সম্মিলিত ধর্মীয় আচার পালনের জায়গা। এখানে সবাই মিলে বৈঠক করত, পূজার পূর্ব-পরবর্তী প্রস্তুতি ও সিদ্ধান্তও হয়তো এখানেই নেওয়া হতো।

চিত্র নং ৭: দ্বিতীয় শিব মন্দির নারীপ্রধান

বৈঠকখানায় একসময় একটি গুরুত্বপূর্ণ মূর্তি স্থাপিত ছিল, যা বর্তমানে গুয়াহাটি সংগ্রহালয়ে স্থান পেয়েছে। ফলে বৈঠকখানা এক অর্থে মন্দির-কমপ্লেক্সের সামাজিক-সাংগঠনিক কেন্দ্র, যেখানে ভক্ত, পুরোহিত, গুরুবর্গ ও সম্ভবত স্থানীয় নেতৃত্ব একত্র হতেন।[১১]

এইভাবে দেখা যায়, রাজবাড়ির মূল প্রাঙ্গণের ছয়টি মন্দির শুধুই ছয়টি পৃথক স্থাপনা নয়; বরং একটি সুসংগঠিত ধর্মীয়-সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন অঙ্গ। হরগৌরীর ঐক্যরূপ, ভৈরবের রুদ্রতা, মূল শিবের নিত্যপূজা, নারীকেন্দ্রিক দ্বিতীয় শিব মন্দির, বৈঠকখানা, সব মিলিয়ে এই প্রাঙ্গণ এক সভ্যতার নিঃশব্দ, অথচ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চিত্র নং ৮: বৈঠকখানা

রাজবাড়ি–সংলগ্ন সবচেয়ে রহস্যময় মন্দিরগুলোর একটি হল শংখ্যাদেবী মন্দির। এটি যোগীজানের এক উপশাখা নদীর তীরে অবস্থিত, এবং এর স্তম্ভ, দেওয়াল ও প্রবেশদ্বারে প্রায় সর্বত্রই নারীমূর্তি খোদিত। উদ্ধারকালে এখানে পাওয়া নারীমূর্তিটির চোখ থেকে নীল বর্ণের আলো বিকিরণের কাহিনি স্থানীয় লোকবিশ্বাসে আজও উজ্জ্বল। মণিপুরি ভাষায় "সংখ্যা" শব্দের অর্থ "নীলা"— এ থেকেই মন্দিরটির নাম শংখ্যাদেবী, আর দেবীর অবস্থানকে অনেকেই "কামাখ্যা নীলয়" বলে মানেন। কালিকাপুরাণে উল্লেখিত কামাখ্যা নীলয়ের সঙ্গে কপিলি–যমুনা উপত্যকার স্থানের যে মিল দেখানো হয়, তার একটি শক্তিশালী প্রতীক হয়ে ওঠে এই মন্দির। বর্তমানে মূল মূর্তিটি নাভাঙা মন্দিরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে সংরক্ষিত হলেও, শংখ্যাদেবী মন্দিরের ভগ্ন প্রাচীর আজও যেন দেবীর নীরব উপস্থিতি অনুভব করিয়ে দেয়।[১২]

চিত্র নং ৯:
শংখ্যাদেবী মন্দিরের সেই স্থান, যেখান থেকে দেবীর মূর্তি নিয়ে বর্তমানে নাভাঙ্গা মন্দিরে রাখা হয়।

এখানের ভাস্কর্য শুধু ধর্মীয় প্রতীকের সীমায় আবদ্ধ নয়; এটি মানসিক, কল্পনামূলক এবং দৈনন্দিন অভিজ্ঞতারও নানান স্তরকে ধারণ করে। এখানে ব্যবহৃত কালো পাথর, রক্তশীলা (Bloodstone), এবং দূর অঞ্চল থেকে আনা বিশেষ প্রস্তরখণ্ডগুলো সেই সময়ের বাণিজ্য–সংযোগ ও নির্মাণ–রুচি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়। রক্তশীলা দ্বারা নির্মিত এক ভগ্ন গরু–মূর্তির অংশ আজও রাজবাড়িতে সংরক্ষিত। এই পাথরে জল ঢাললেই লাল আভা ফুটে ওঠে বলে স্থানীয়রা প্রত্যক্ষ অনুভবের কথা জানান; তাই এই পাথরের নাম হয়েছে "ব্লাড স্টোন"— রক্তের মত আভাযুক্ত পাথর। এমন প্রস্তর স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য নয়; ধারণা করা হয়, উত্তর ভারতের কনৌজ অঞ্চল থেকে এধরনের পাথর আনা হয়েছিল, যদিও এই মতও গবেষণার স্তরেই সীমাবদ্ধ। আরও এক বিশেষ দিক হল এখানে পাওয়া দুটি ভিন্ন প্রজাতির প্রণীর মিলনের ভাস্কর্য, একটি চিত্রে হাতি ও ঘোড়ার মিলনে জন্ম নেওয়া এক অদ্ভুত প্রাণীর মূর্তি। স্থানীয় বিশ্বাস, প্রকৃতিতে এমন অস্বাভাবিক মিলন–ঘটনা তারা প্রত্যক্ষ করেছিল বলেই তার স্মৃতি পাথরে খোদাই করে রেখেছে। বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা যাই হোক, এইসব ভাস্কর্য প্রাচীন মানসিক জগতের এক সাহসী, কল্পনাপ্রবণ ও প্রশ্নমুখর চেহারাকে সামনে আনে। পাথরে দেখা যায় সরাই–আকৃতির এক বিশেষ রূপ, যা অসমের ঐতিহ্যবাহী 'সরাই' পাত্রের আদল মনে করিয়ে দেয়। স্থানীয়দের বিশ্বাস, অসমের এখনকার বহুল ব্যবহৃত সরাই–এর আদি নকশা হয়তো এখানকার এই শিলাভাস্কর্য থেকেই প্রভাবিত। অন্যান্য মন্দিরভাস্কর্যে এই নির্দিষ্ট সরাই আকৃতি তেমন দেখা না গেলেও, শংখ্যাদেবী মন্দিরে এর সুস্পষ্ট উপস্থিতি রাজবাড়িকে এক বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেয়।[১৩]

চিত্র নং ১০: ব্লাডস্টোনের তৈরি ভগ্ন মূর্তি

একই এলাকায় অন্তত ছয় থেকে নয়টি মন্দিরের পরিকল্পিত বিন্যাস, চারদিকে শিবমন্দির আর মাঝখানে কামাখ্যা–নির্ভর শক্তিস্থাপনা, সব মিলিয়ে এই অঞ্চল একসময়ে সুগঠিত নগর–সভ্যতার অংশ ছিল বলেই

চিত্র নং ১১: ভগ্ন দেয়ালে সরাই-এর ভাস্কর্য

প্রতীয়মান হয়। পথঘাট, সরোবর, নদী–সংযোগ, মন্দির–কমপ্লেক্স এসবের মাধ্যমে এখানে ধর্ম ও দৈনন্দিন জীবনের এক অচ্ছেদ্য সংযোগ গড়ে উঠেছিল।

আজ রাজবাড়িতে দাঁড়িয়ে যে সব ভগ্ন গম্বুজ, ভাঙা শিবলিঙ্গ, ছিন্ন ভাস্কর্য চোখে পড়ে, তাদের অনেকটাই হয়ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত—ভূমিকম্প, বন্যা কিংবা সময়ের অবিরাম ক্ষয়ের ধাক্কায়। অনেকের মতে, দেশ–বিদেশ থেকে আসা আক্রমণকারী ও লুটেরা শাসকদল ইচ্ছে করেই মন্দির ধ্বংস করেছে, দেবমূর্তি ভেঙেছে, সম্পদ লুট করেছে। লিখিত প্রমাণের অভাবে নিশ্চিত কিছু বলা না গেলেও, ধ্বংসের চিহ্নগুলো এখনো যেন সেই দিনগুলোর স্মৃতি বহন করে। গ্রামটির যখন প্রথম অনুসন্ধান হয়, তখন বলা হয় এখানে তেমন জনবসতি ছিল না; অর্থাৎ মানুষ অনেক পরে এসে এই নিঃশব্দ ধ্বংসস্তূপকে ঘিরে নতুন জীবন গড়েছে। ফলে রাজবাড়ি এক অর্থে "দ্বিগুণ ইতিহাস" বহন করে—একটি প্রাচীন সভ্যতার, অন্যটি পরবর্তী জনবসতির।[১৪]

আজও রাজবাড়ির মূল শিব মন্দিরে পূজা হয়; আধুনিক ত্রিশূলের সারি পুরনো ভগ্ন ত্রিশূলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন দুই যুগের ভক্তি এক প্রাঙ্গণে মিলিত হয়েছে। নাউভাঙা মন্দিরে প্রতিবছর ধুমধাম করে কালীপুজো হয়। ভগ্নদেওয়ালে খোদিত নারী, সর্প, গরু, হাতি, ঘোড়া আর দেব–দেবীর ভাস্কর্য দেখে আজও অনেক দর্শনার্থী বিস্মিত হয়—কেমন করে এমন সূক্ষ্ম কারুকাজ সম্ভব হয়েছিল সেই সময়ে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই! কারো কাছে এগুলো নিছক শিল্প, কারো কাছে দেবতা, কারো কাছে ইতিহাসের দলিল; কিন্তু সকলের কাছেই এক ধরণের নীরব মুগ্ধতা তৈরি হয়। এটি আজ সরকারি ভাবে সুরক্ষিত প্রত্নস্থল। অনেক ভাস্কর্য, শিলাপ্রতিমা ও নিদর্শন স্থানীয় সংগ্রালয়ে এবং গুয়াহাটি প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘরে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজবাড়িকে নিয়ে শিক্ষাসফর, ফিল্ড–স্টাডি ও গবেষণা করছে কপিলি–যমুনা উপত্যকা নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণাপত্রও তৈরি হচ্ছে, যেখানে যোগীজান বারবার উল্লেখিত হচ্ছে। তবু এখনো এই প্রত্নতাত্ত্বিক পরিসর সম্পূর্ণভাবে উৎঘাটিত হয়নি।[১৫]

চিত্র নং ১২.
ভিন্ন জাতের প্রাণীর যৌনমিলনের ভাস্কর্য (হাইব্রিড)

রাজবাড়ির সীমানার অনেক জায়গায় আজও খনন হয়নি; স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, যদি গভীর ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানো যায়, তবে আরও বহু মূর্তি, স্তম্ভ ও শিলালিপি প্রকাশ পেতে পারে, যা রাজবাড়ির রহস্য আরও স্পষ্ট করে তুলবে। একইসঙ্গে ভয়ও আছে— অবহেলা, প্রাকৃতিক ক্ষয়, কিংবা অপরিকল্পিত পর্যটনের চাপে এই নাজুক ঐতিহ্য আরও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

যোগীজান অঞ্চলের রাজবাড়ি কেবল ইট–পাথরের এক ধ্বংসস্তূপ নয়, এটি অসমের দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার এক প্রতীক, যেখানে প্রাগজ্যোতিষপুরের স্মৃতি, পাল–বর্মণ যুগের প্রত্নচিহ্ন, শৈব–শাক্ত–তান্ত্রিক উপাসনার মেলবন্ধন আর স্থানীয় জনজীবনের নীরব সংগ্রাম একসাথে জড়ানো। তবুও প্রশ্ন থেকে যায়, কতজন সত্যিই জানে হোজাইয়ের যোগীজান আর তার রাজবাড়ির কথা? শুধু প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের ফাইলে নাম নথিভুক্ত

থাকলেই কি কোনও ঐতিহ্য বেঁচে থাকে? নাকি সত্যিকারে বেঁচে থাকা মানে মানুষের মনে, ভাষায়, গল্পে, প্রবন্ধে, গান–কবিতায় সেই স্থানটির অভিবাদন করাকে বোঝায়। রাজবাড়ি তাই আজ এক নীরব আহ্বান—সংরক্ষণের, গভীরতর গবেষণার, আর সর্বোপরি স্মরণে রাখার আহ্বান। কালের প্রবাহে যেন এই খুঁজে পাওয়া ভাস্কর্যগুলো আর কখনও মাটির তলে নিঃশব্দে হারিয়ে না যায়; বরং নতুন প্রজন্মের প্রশ্নমুখর চোখে, জিজ্ঞাসু মনের আঙিনায়, আর ভালোবাসামিশ্রিত গর্বের উচ্চারণে রাজবাড়ির ঐতিহ্যকে ধরে রাখে বিশ্বের দরবারে।

তথ্যসূত্র:

১. সাক্ষাৎকার: দ্বিজমণি সিংহ, পিতা- ঁ সুবল সিংহ, বয়স-৭৫, শিক্ষাগতযোগ্যতা- B.Com, B.ed, পেশা-অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, যোগীজান, রাজবাড়ি, হোজাই,০৬-১১-২০২৫,সকাল ১০:০০টা

২. তদেব।

৩. তদেব।

৪. অনুপ কুমার বরঠাকুর (সম্পা.): 'রাজবারীর রূপকার ঐতিহ্যমিত্র কৃষ্ণ কুমার সিংহর অভিনন্দন গ্রন্থ', দাস প্রিন্টিং প্রেস, হোজাই, অসমিয়া, ২৮-০২-২০২১, পৃ. ৭৯.

৫. সাক্ষাৎকার: দ্বিজমণি সিংহ, পিতা- ঁসুবল সিংহ, বয়স-৭৫, শিক্ষাগতযোগ্যতা- B.Com, B.ed, পেশা-অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, যোগীজান, রাজবাড়ি, হোজাই,০২-১২-২০২৫,সকাল ১১:০০টা

৬. সাক্ষাৎকার: সাহিত্যভূষণ ঙৌবা সিংহ. পিতা-ঁহরিমোহন সিংহ, বয়স-৬৯, শিক্ষাগতযোগ্যতা-B. A, পেশা- অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, যোগীজান, রাজবাড়ি, হোজাই, ০২-১২-২০২৫, বিকাল ০৪:০০টা

৭. শংকর ভাণ্ডারী (সম্পা): 'ঐতিহ্যমণ্ডিত যোগীজানর রাজবারী','যৌগীপ্রভা স্মরণিকা হোজাই জিলা কর্মচারী পরিষদ অষ্টবিংশতিতম পূর্ণাঙ্গ বার্ষিক অধিবেশণ-২০২২' আই, টী, প্রেছ, নীলবাগান, হোজাই, অসমিয়া, ২০২২

৮. সাক্ষাৎকার: ঐতিহ্যমিত্র কৃষ্ণ কুমার সিংহ. পিতা-ঁবাসনা সিংহ, বয়স-৮৮, শিক্ষাগতযোগ্যতা-H.S.L.C, পেশা-সমাজসেবক, যোগীজান, রাজবাড়ি, হোজাই,০২-১২-২০২৫, বিকাল ০৩:০০টা

৯. সাক্ষাৎকার: জি. কে. সিংহ. পিতা- ঁফুল সিংহ, বয়স-৭৬, শিক্ষাগতযোগ্যতা- H.S, পেশা-দক্ষিণ যুগীজান সমবায় সমিতির সভাপতি, যোগীজান, রাজবাড়ি. হোজাই. ০১-১২-২০২৫,সকাল ১০:০০টা

১০. সাক্ষাৎকার: দ্বিজমণি সিংহ, পিতা- ঁসুবল সিংহ, বয়স-৭৫, শিক্ষাগতযোগ্যতা- B.Com, B.ed, পেশা-অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, যোগীজান, রাজবাড়ি, হোজাই,০২-১২-২০২৫,সকাল ১১:০০টা

১১. তদেব।

১২. তদেব।

১৩. তদেব।

১৪. তদেব।

১৫. তদেব।